দৈনিক ইনকিলাব

MAY 14 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী

জ্ঞানপিপাসুদের দুঃখ কথা শোনার আছে কেউ

নাইম-উল-করিম

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর অবস্থার নিরিখে প্রমথ চৌধুরীর 'বইপড়া' প্রবন্ধে লেখা 'এ যুগে যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য সে জাতির ধনের ভাঁড়েও ভবানী' উক্তিটি বিশেষভাবে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্পেনের মুসলমান সভ্যতা' শিরোনামে লেখা প্রবন্ধের কথা। তিনি লেখেন, "কর্ডোভা নগরী স্বীয় গৌরবের দিনে জ্ঞানালোচনা এবং শিক্ষার কোলাহলে যেমন মুখরিত তেমনি আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার মহিমায় শীর্ষ স্থানীয় ছিল।" এছাড়াও তিনি আরও লেখেন, "কর্ডোভার বিরাট বিজ্ঞানাগারে ছাত্র মণ্ডলীকে যন্ত্র সংযোগ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ শিক্ষা দেওয়া হইত। সাধারণের পাঠের জন্য সপ্তদশটি বিরাট লাইব্রেরী এবং বহু সংখ্যক পাঠ সম্মিলনী (ক্লাব) ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক স্কুল-কলেজ এবং সমাজকে ছাত্র মণ্ডলীর এবং উপাসকদিগের পাঠের জন্য বিবিধ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত।" সুতরাং জ্ঞানের সাধনায় বই এবং পাঠাগারের গুরুত্ব যে অধিক তা আজ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই বোধগম্য। জ্ঞানার্জনের জন্য বইয়ের গুরুত্ব যতটুকু যথোপযুক্ত, নিরিবিলি পরিবেশের একটি পাঠাগারের গুরুত্ব তারচেয়ে কোন অংশে কম নয়। কম নয় বলেই প্রমথ চৌধুরী বলেন, "আমি লাইব্রেরীকে স্কুল কলেজের উপর স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোক স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়।" এভাবে জ্ঞানার্জনে লাইব্রেরী এবং বইয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিক এবং সমাজের কর্ণধারগণ সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন, নেয়া হয়েছে বইয়ের সহজলভ্যতার এবং বই পাঠে পাঠককে বিশেষ মনোযোগী করতে প্রয়োজনীয় যথাযথ পদক্ষেপ। আজকের দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নেই যেই দেশে সাধারণ পাঠকের জ্ঞানার্জনের সুবিধার্থে নেয় না কোন বিশেষ পদক্ষেপ। বাংলাদেশও যে এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তা নয়, বছরে বেশ কয়েকবার বইমেলার আয়োজন, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণাসহ নানা পদক্ষেপ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ পাঠকের জ্ঞানার্জনে কি করা হচ্ছে?

সাধারণ পাঠকের জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাঠাগারটি রাজধানী ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের পাশে অবস্থিত। নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে গড়ে উঠেছে এই পাঠাগারটি। জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরীর অবস্থাই যখন এমন শোচনীয় তখন দেশের অন্যান্য পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর অবস্থা কেমন হতে পারে তা পাঠকদের বিবেচনায় রাখলাম। অতি সম্প্রতি বিটিভি কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে। এই প্রতিবেদনের ভিডিও চিত্রধারণের সময় আমি নিজেও লাইব্রেরীতে উপস্থিত ছিলাম। ঐ টিভি প্রতিবেদককে লাইব্রেরীর নানা সমস্যার বিষয়ে জানাতে গেলে তিনি বলেন, "এই প্রতিবেদনটি বিটিভির জন্য" অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন কোন খারাপ দিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা যাবে না। এখন প্রশ্ন, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী বা বিটিভি পরিচালক কি ঐ প্রতিবেদককে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে নিষেধ করেছেন? নাকি তিনি নিজেই কোন কারণে খারাপ বিষয়গুলো উত্থাপনে অনাগ্রহী। কিন্তু কেন?

এই লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বইয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন শ্রেণীর পাঠকের প্রয়োজনীয় বইয়ের স্বল্পতা রয়েছে। এখন এই প্রশ্নের সাথে আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে, কারা এই লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক?

পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়তে আসা এমন কিছু পাঠক রয়েছে যারা দিনের বেশীর ভাগ সময়ই এই লাইব্রেরীতে বসেই কাটান। নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই, ট্যাপের পানি খাওয়ার গ্লাসটি তো থাকে না বেশীর ভাগ দিনই। মেয়েদের টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকলেও ছেলেদের জন্য একটি মাত্র টয়লেট থাকায় অনেককেই মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা আজকাল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাইট বা কোন ফ্যান একবার নষ্ট হলে তা সহজে ঠিক হবার সম্ভাবনা থাকে না?

প্রথমত, অতি দামী অনেক মূল্যবান বই সকল পাঠকের পক্ষে কেনা সম্ভব না– দ্বিতীয়ত, পাবলিক লাইব্রেরীর মত এমন নিরিবিলি পরিবেশে পড়ার সুযোগ এই শহরে অনেক পাঠকেরই নেই। সুতরাং পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী যদি বই না থাকে সেক্ষেত্রে কি কোন একটি লাইব্রেরীকে মাকাল ফল বলা ভুল হবে? পাবলিক লাইব্রেরীতে বর্তমানে সেলফ পরিপূর্ণ করে রাখা বইগুলোর ক'টি বই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর কেনা তাও কারো অজ্ঞাত নয়। কারণ একশ'টি বইয়ের অন্তত পক্ষে ৯৫টির গায়ের সিলই তা প্রমাণ করে যে, এগুলো পাকিস্তান আমলের। অতিগুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর বেশীর ভাগেরই গুরুত্বপূর্ণ পাতাগুলো নেই। পাবলিক লাইব্রেরীর সেলফে পোড়া পাচ্ছে বইগুলোর কি কোনটির নতুন সংস্করণ হয় না। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় হতে বর্তমান অবধি কি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বই নতুন প্রকাশের মাত্রা কমে গেল; নাকি পাবলিক লাইব্রেরীতে বই কেনার জন্য সরকার কোন আর্থিক বরাদ্দ দেয় না; এসব প্রশ্ন আজ সাধারণ পাঠকের।

পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়তে আসা এমন কিছু পাঠক রয়েছে যারা দিনের বেশীর ভাগ সময়ই এই লাইব্রেরীতে বসেই কাটান। নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই, ট্যাপের পানি খাওয়ার গ্লাসটি তো থাকে না বেশীর ভাগ দিনই। মেয়েদের টয়লেটের অবস্থা না থাকলেও ছেলেদের জন্য একটি মাত্র টয়লেট থাকায় অনেককেই মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা আজকাল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাইট বা কোন ফ্যান একবার নষ্ট হলে তা সহজে ঠিক হবার সম্ভাবনা থাকে না? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটি সেলফগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তবে স্বীকার করতে হবে, লোকবল অনুযায়ী তা যথেষ্ট ভাল। অতীতে একটি টেলিফোন লাইন থাকলেও বর্তমানে তা নেই। মনে রাখা দরকার এখানে যারা আসছেন তারা সাধারণ পাঠক এবং সত্যিকারের পাঠক। সুতরাং তাদের সকল সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

পাবলিক লাইব্রেরীর ভেতরের পরিবেশ অবশ্য খুবই নিরিবিলি। এজন্য পাঠক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। ভেতরের পরিবেশ নিরিবিলি হলেও বাইরের পরিবেশের কারণে তা আর আজকাল নিরিবিলি থাকছে না। লাইব্রেরীতে প্রবেশের ডান পাশের ছোট সেমিনার কক্ষটিতে আজকাল প্রতিনিয়তই নানারকম অসংযত আচার-অনুষ্ঠান, ব্যান্ডসংগীতের মত অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে। সে জন্য সাউন্ড বক্স বা ব্যবহৃত মাইকের আওয়াজ পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। পাবলিক লাইব্রেরী অঙ্গনে আজকাল প্রতিনিয়তই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আমি ওসব অনুষ্ঠানের বিপক্ষে নই; কিন্তু বলতে চাচ্ছি, একের পর এক আয়োজিত ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানগুলোতেই মাইক ব্যবহার করা হয়, যা অবশ্যই পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাতের কারণ। এছাড়া শাহবাগ মোড়ের চলাচলকারী যানবাহনের শব্দও পাঠকের মনোযোগে ব্যাঘাতের কারণ। চারুকলার দিক থেকে অবশ্য খুব কদাচিৎই কোন আওয়াজ-হট্টগোল হয়। লাইব্রেরীর আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো ক্যান্টিন ও মসজিদ। ক্যান্টিনের খাদ্যদ্রব্য সাধারণ পাঠকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিনা তাও কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনায় রাখা উচিত। পড়তে আসা অনেকেই নামাজ পড়তে চান। অনেক সময় নামাজের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত কক্ষটিতে স্থান সংকুলান হয় না। এছাড়া নিয়মিত ইমাম না থাকাও সমস্যা হয়। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। মেধাবী প্রতিভাগুলোর বিকাশ ঘটাতে একটি প্রয়োজনীয় বই এবং একটি লাইব্রেরী অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই লাইব্রেরীর প্রতি যথাযথ নজর প্রদান আজ সময়ের দাবী। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলনের বেশ কিছু কর্মকাণ্ড শুধু আমার নয়, অনেকের মাঝেই বোধহয় এক ধরনের আশার সঞ্চার করেছে। পাবলিক লাইব্রেরী বিষয়ে আমার মত অনেকের ধারণা, আমাদের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এসব বিষয় জানেন না।

পত্রিকায় লিখলে তার চোখে পড়বে এবং তিনি হঠাৎ একদিন লাইব্রেরী পরিদর্শনে আসবেন। তাদের অনুরোধে আমি এ লেখাটি লিখছি। এ দেশে জ্ঞানপিপাসুদের সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। আশা করি তিনি আমাদের নিরাশ করবেন না। যা করণীয় তাই করবেন। লাইব্রেরীর সকল কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করতে কম্পিউটারসহ সকল প্রকার আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে বইয়ের পাতা কাটা ও বই চুরি বন্ধ করতে ভিডিও ক্যামেরা স্থাপন করা একান্তই আবশ্যক। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর লেখা অনুযায়ী সুদূর অতীতেও যে লাইব্রেরীর গুরুত্ব কত অধিক ছিল তা খুব সহজেই প্রতীয়মান হয়। তিনি লেখেন, তৎকালে যে ব্যক্তি বাটিতে ছাত্র জায়গীর এবং লাইব্রেরী না রাখিতেন, তিনি অত্যন্ত অভদ্র এবং অশিক্ষিত বলিয়া সমাজে লাঞ্ছিত হইতেন আর অবহেলা নয়, আসুন এবার সরকারী ও বেসরকারীভাবে পরিচালিত সকল লাইব্রেরীগুলোর ব্যাপারে সদা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখি।